Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 443–448
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

শিকড়ের ডানা হোক ডানার শিকড় : বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের ভাবনা

সাফিউল্লা মোল্লা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: safiul379@gmail.com

Keyword
বাদল সরকার, থিয়েটার দর্শন, নাট্যসাহিত্য, মুক্তমঞ্চ, পথচলতি শ্রমজীবী, তৃতীয় থিয়েটার, অঙ্গনমঞ্চ

Abstract
আমাদের দেশে বাদল সরকার এক অন্য ধারার থিয়েটারচর্চার নাম। তিনি তৃতীয় থিয়েটার নামে যে থিয়েটার গড়ে তুলেছিলেন তা একদিকে যেমন বিকল্প থিয়েটার, একইভাবে নতুন একটা থিয়েটার দর্শন, সেইসাথে মানুষের কাছাকাছি আসার একটি মাধ্যমও বটে। এই যে মানুষের কাছে আসা, এটা সেই প্রাচীন কাল থেকেই ছিল। থিয়েটার বরাবর সেই মানুষকে নিয়ে, মানুষের কাছেই ফিরতে চেয়েছে, কেননা যেকোন শিল্পের শেষ কথাই হল মানুষ। শুধু শিল্প কেন সাহিত্য-সমাজ-রাজনীতি সবেতেই মানুষই শেষ কথা হওয়া উচিত। বাদলবাবু মুক্তমঞ্চের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে শুধু নয়, নাট্যসাহিত্যের মধ্যেও মানুষের কাছে পৌঁছনোর পথকে উন্মুক্ত করে দিতে পেরেছিলেন।

এই যে মানুষের কথা বলছি, এরা কারা? কোন মানুষ? এরা মূলত সেই মানুষ যারা মিছিল নাটকের আগ্রভাগে থেকে মানুষকে পথ দেখায়। এরা সেই মানুষ যারা বৃহত্তর সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। আমাদের সংস্কৃতির শিকড়। শ্রী সরকার এই সংস্কৃতি ও তার মানুষকে তুলে ধরেছেন তৃতীয় থিয়েটারে। পথচলতি শ্রমজীবী, খেটে খাওয়া মানুষকে নিয়ে এলেন বিশ্বের দরবারে এবং এই বার্তাই দিতে চাইলেন, আমরা শিকড়কে যেন না ভুলি, শিকড়ের ডানা হোক ডানার শিকড়।

Discussion

এক

আমাদের দেশে বাদল সরকার এক ভিন্ন ধারার থিয়েটার চর্চার নাম। যে ধারাটির সাথে প্রায় সকলেই পরিচিত, সেটি তৃতীয় ধারার থিয়েটার। গ্রামীন থিয়েটার বা লোকনাট্য ছিল প্রথম থিয়েটার এবং এর থেকে স্বতন্ত্র শহুরে থিয়েটার যা মূলত প্রসেনিয়াম বা গ্রুপ থিয়েটার হল দ্বিতীয় থিয়েটার। এই দুই রীতি থেকে আলাদা ছিল বলে বাদল সরকারের নির্মিত থিয়েটারের নাম তৃতীয় থিয়েটার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য থার্ড থিয়েটার বা তৃতীয় থিয়েটার কথাটি শ্রী সরকারের সৃষ্টি

নয়। ১৯৬৯ সালে মার্কিনী নাট্যসমালোচক রবার্ট ব্রুস্টাইনের থার্ড থিয়েটার নামে একটি বই প্রকাশিত হয়, সেখানে ওই নামে একটি প্রবন্ধ ছিল, যেটি ছয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে লিখিত। সেখানে তিনি প্রচলিত থিয়েটারের (একটি ধারা চিন্তাহীন, বক্তব্যহীন, কমেডি নাটকের, অন্যটি গম্ভীর, বক্তব্যপ্রধান বুদ্ধিজীবীদের নাট্যধারা) বাইরে বেরিয়ে চলতে থাকা বেশ কিছু থিয়েটার চর্চাকে (জুলিয়ান বেক আর জুডিথ ম্যালিনার লিভিং থিয়েটার, তরুণদের ভিয়েতনামের যুদ্ধবিরোধী নাট্যকর্ম প্রভৃতি) তৃতীয় থিয়েটার আখ্যা দিয়েছেন। তফাৎ এটুকুই যে ব্রুস্টাইনের লেখায় তৃতীয় থিয়েটার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটার সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়া একটা ব্যাপক থিয়েটার। স্বাভাবিকভাবে মনে হতে পারে এদেশে এমন একটা বিকল্প থিয়েটার গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করলেন কেন?

একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাব সদ্য স্বাধীনতা পাওয়া একটা দেশ তখন নিজস্বতার খোঁজে বারবার নিজেকে ভেঙে গড়ে নিচ্ছে। থিয়েটারও খুঁজতে চাইছে নিজস্ব ভাষা, বলবার ভাষা। তার জন্য নিজেকে বারবার ভিন্ন ভিন্ন নামে, ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে বদলে ফেলে পৌঁছতে চাইছে মানুষের কাছে। মানুষকে শিক্ষিত করে সমাজ বদলের স্বপ্ন তাদের চোখে। শম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে নির্মাণ করতে চাইলেন নাট্যভাষা, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করলেন প্রাশ্চাত্যের নাটকের বঙ্গীকরণের মাধ্যমে নিজস্ব রূপ প্রকরণ তৈরি করা সম্ভব। বাদল সরকার এই দুই রীতির বাইরে গিয়ে জোর দিতে চাইলেন মানুষের শারীরিক অভিনয় রীতির উপর, আর তার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছতে চাইলেন। বলতে চাইলেন মানুষের ভাষা হোক থিয়েটারের ভাষা। এখানেই প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সাথে বিরোধের সূত্রপাত। কেননা প্রসেনিয়াম বা শহুরে থিয়েটার মানে তিনদিক বন্ধ, সামনের দিক খোলা যেদিক দিয়ে দর্শকের সাথে কুশীলবদের সাক্ষাৎ ঘটে। কিন্তু সরাসরি যোগাযোগ তখনকার নাট্য প্রযোজকদের অনেকের পছন্দ না হওয়াতে সেখানেও গড়ে উঠেছিল অদৃশ্য এক চতুর্থ প্রাচীর। দর্শকের সাথে অভিনেতার দূরত্ব ক্রমেই বেড়ে চলল। এই ফর্মকেই বাদলবাবু ভাঙতে চেয়েছিলেন তৃতীয় থিয়েটারে। সোজা কথায় তিনি দর্শকের সাথে অভিনেতার একাত্মতা চেয়েছিলেন। তাই যদি হয় তাহলে প্রথম থিয়েটার বা লোকনাট্য (তিনি মূলত যাত্রাকেই বোঝাতে চেয়েছেন) তো সেই অভাবকে পূরণ করে আসছে প্রাচীন কাল থেকেই। মাঝখানে বসত আসর, চারিদিকে দর্শক, অভিনেতারা দর্শকের ভিতর থেকে আসতেন, আবার মিশে যেতেন দর্শকের সাথেই। কিন্তু বাদ সাধল মূল্যবোধের প্রশ্নে। থিয়েটারের ভাষা গ্রন্থে জানিয়েছেন-

> "লোকনাট্যের বিষয়বস্তু প্রধানত পিছিয়ে থাকা অথবা প্রতিক্রিয়াশীল মূল্যবোধে ভারাক্রান্ত, দেবদেবীর জয়গান, রাজা-রাজড়ার উপাখ্যান দেখানো। অর্থাৎ এ জীবনে উপবাস অত্যাচার অবিচার সবই ঈশ্বরের লীলা বা পূর্বজন্মের কর্মফল বলে ধরে নিয়ে সহ্য করা, পরলোকে বা পরজন্মে মুক্তি আছে, সুখ আছে অথবা রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, রাজভক্তি পরমধর্ম।"[১]

সুতরাং তৃতীয় থিয়েটারে শুধু মানুষের সাথে একাত্মতা নয়, তার মধ্যে মূল্যবোধ তথা সমাজ পরিবর্তনের রসদ থাকবে। এই সমাজ পরিবর্তন করবার তাগিদই হল তৃতীয় থিয়েটারের প্রাণ।

আপাতভাবে মনে হতে পারে বাদল সরকার প্রবর্তিত তৃতীয় থিয়েটার প্রসেনিয়াম থিয়েটার এবং গ্রামীণ লোকনাট্যের পরিপন্থী। সেকারণেই প্রসেনিয়াম পন্থীরা শুরু থেকেই তাকে আক্রমণ করতে ছাড়েননি। নব্বইয়ের দশকে হীরেন ভট্টাচার্য তাঁর 'প্রসেনিয়াম থিয়েটার ও পথনাটক : প্রভেদ ও সম্পর্ক'[২] লেখাতে সরাসরি সেকথা তুলে ধরেছেন এভাবে- 'প্রসেনিয়ামের বিরুদ্ধে থার্ড থিয়েটার জেহাদ ঘোষণা করেছেন আধুনিককালে নাট্যকার বাদল সরকার। তিনি বিপ্লবের দোহাই দিয়ে অ্যান্টি প্রসেনিয়াম স্লোগান তুলেছেন। কিন্তু ইতিহাস তাঁর বিপক্ষেই রায় দেয়। জনগনের সংগ্রামী নাটক প্রসেনিয়ামে অভিনীত হলে কেন তাকে বর্জন করতে হবে তার কোনো সন্তোষজনক কারণ বাদলবাবু দেখাননি, তিনি বলেছেন যে শহুরে প্রসেনিয়াম থিয়েটারে বিপ্লবের কথা বলা মানে ভস্মে ঘি ঢালা- কেননা ওখানকার দর্শক মধ্যবিত্ত- যার কোন বিপ্লবী চরিত্র নেই।' তবে বাদল সরকার নিজে কোনো তর্ক বিতর্কে পক্ষ নিয়েছিলেন এমন তথ্য জানা যায়না। এটুকু জানা যায় তিনি এর উত্তর তাঁর 'The Third Theatre' গ্রন্থে আগেই জানিয়েছিলেন। তাঁর মতে তৃতীয় থিয়েটারের উদ্দেশ্য কখনোই বাকি দুই ধারার থিয়েটারের বিরোধীতা করা নয়, দুই ধারাকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে

তাদের দুর্বলতা এবং শক্তির কেন্দ্র খুঁজে বের করা। দুই থিয়েটারের সাঙ্গীকৃত নতুন্ থিয়েটার তৈরির প্রচেষ্টা। শুধু প্রচেষ্টা নয়, নাট্যকারের নিজের ভাষায় তৃতীয় থিয়েটার একটি দর্শন, একটি ভাবধারা, একটি বিকল্পচিন্তা। যে চিন্তাধারা সত্তরের দশকের টালমাটাল সমাজে হঠাৎ করে উদিত হয়নি, এর পিছনে রয়েছে তাঁর জীবন অভিজ্ঞতার বিস্তৃত এক অধ্যায়।

দুই

১৯২৫ সালে ১৫ই জুলাই কলকাতায় জন্ম বাদল সরকারের। ১৯৪৭ এ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি লাভের পর চাকরি সূত্রে বিভিন্ন দেশে (১৯৫৩-৫৭ মাইথনে, ১৯৫৭-৫৯ লন্ডনে, ১৯৬৩-৬৪ ফ্রান্সে, ১৯৬৪-৬৭ নাইজেরিয়াতে) ঘুরেছেন। সংগ্রহ করে নিচ্ছিলেন রসদ। মাইথনে থাকার সময়েই মূলত নাটকে অভিনয়ের প্রচেষ্টা এবং নাটক লেখার সূত্রপাত ১৯৫৬ সাল নাগাদ। তাঁর দীর্ঘ নাট্যকর্মকে শ্রী পবিত্র সরকার মহাশয় তাঁর থার্ড থিয়েটার, ফোর্থ থিয়েটার প্রবন্ধে[৩] তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। ১৯৫৬-৬২ সাল মূলত হাস্যরসাত্মক নাটক ও বঙ্গীকরণের পর্যায়, এই পর্বে তিনি চারটি নাটক লিখেছেন- সলিউশন এক্স, রাম শ্যাম যদু, বড়ো পিসীমা, এবং শনিবার। ১৯৬২ এর পর অর্থাৎ এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে যে নাটকগুলি রচিত হচ্ছে তাতে নাটকের ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা নতুন আখ্যান নির্মাণ করতে চাইছেন। এই ধারাতেই লিখছেন সারারাত্তির, বল্লভপুরের রূপকথা, কবিকাহিনী, বিচিত্রানুষ্ঠান, বাকি ইতিহাস, পরে কোনোদিন, পাগলা ঘোড়া, শেষ নেই, ত্রিংশ শতাব্দী। এখান থেকেই মূলত মানবিক দায়বোধের তাগিদ লক্ষ করা যাচ্ছে। তৃতীয় ধারাতে তিনি যে নাটকগুলি রচনা করলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাগিনা মাহাতো, স্পার্টাকুস, মিছিল, প্রস্তাব, ভানুমতী কা খেল, লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী, নাট্যকারের সন্ধানে তিনটি চরিত্র, রূপকথার কেলেঙ্কারি, ভোমা, সুখপাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস, হট্টমালার ওপারে ইত্যাদি।

শেষ পর্যায় থেকেই তিনি মূলত তৃতীয় থিয়েটারে প্রবেশ করছেন। ১৯৭১ এর ২৪ শে অক্টোবর মধ্য কলকাতার এ বি টি এ হলে সাগিনা মাহাতো অভিনয়ের মধ্য দিয়ে প্রথম প্রসেনিয়াম ভাঙা অভিনয়ের সূত্রপাত। খেয়াল করলে দেখতে পাব এর কিছু আগে প্রসেনিয়াম বিদ্বেষী রিচার্ড শেখনারের সাথে কাজ করতে (১৯৭১ এর জুন থেকে ১৯৭৩ এর মে পর্যন্ত জহরলাল নেহেরু ফেলোশিপ) বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। তারও আগে গ্রোটাউস্কির সাথে ইন্টারভিউ, এমনকি ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত লন্ডন-মস্কো-পোল্যান্ডে প্রচুর থিয়েটার দেখার অভিজ্ঞতা এসমস্ত কিছুই শ্রী সরকারকে নতুন মঞ্চ ভাবনার পথে নিয়ে এসেছিল সন্দেহ নেই। কেমন ছিল সে মঞ্চ নির্মাণ?

> "নানা ধরণের কয়েকটি কাঠের বাক্স দিয়ে কারখানা, পার্টি অফিস, ভাটিখানা, রাস্তা আর সাগিনার ঘর করা হয়েছিল। বাক্সগুলো নানান সময় নানাদিকে সরিয়ে অবস্থান বদলানো হত।"[৪]

চেয়ারগুলিকে হলের মাঝখান থেকে সরিয়ে দর্শকদের বসার জায়গা হল চারিদিকে, অভিনয় হল মাঝখানের ফাঁকা জায়গায়। এখান থেকেই মূলত অঙ্গনমঞ্চের ধারণার সূত্রপাত। আকাদেমিতে অঙ্গনমঞ্চের অভিনয় শুরু হল পরের বছর ১২ই নভেম্বর ১৯৭২ সালে স্পার্টাকুস নাটক দিয়ে। এই মঞ্চ আসলে থার্ড থিয়েটারেরই একটি বিশেষ রূপ, একটি ঘনিষ্ঠ থিয়েটারের রূপ, যেখানে দরসক-অভিনেতার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা থাকে, তারা একই তলে, ধরাছোঁয়ার মধ্যে থাকে। থিয়েটারের সাথে মানুষের ঘনিষ্ঠতার কথা যদি বলি তাহলে প্রাশ্চাত্যে বহু আগেই ব্রেশট ১৯২৬ সালে মেহর গুটেনশপোর্ট প্রবন্ধে[৫] সেকথা বলে গেছেন। প্রসেনিয়াম বিরোধী দৈনন্দিন থিয়েটার নিয়ে কবিতায় কথাটিকে আরো জোরের সাথে স্পষ্ট করেছেন-

> "যদি তোমাদের থিয়েটারের মহত্তর কোন উদ্দেশ্য বা উপলক্ষ না থাকে, যদি তার মধ্যে না থাকে দর্শকদের জীবনের উষ্ণ শরিকানা, আর তাহলে সেটা তেমন কোনো কাজেই লাগবে না।"[৬]

বাদলবাবুও প্রসেনিয়ামের বিপরীতে হেঁটে প্রচলিত নিয়মকে ভাঙতে চাইলেন। যদিও এই নিয়ম ভাঙার ইঙ্গিত এবং ইন্দ্রজিৎ থেকেই আঁচ করা গেছে। সেই পথেই নিয়ম ভেঙে এগিয়েছে মানুষের মিছিল, মানুষই নিজের অধিকারের কথা জানাতে নিজেই পথে নেমেছে নাট্যকারের সন্ধানে। সেই পথেই শুরু হল তৃতীয় থিয়েটারের আরেক অভিনয়রীতি,

মুক্তমঞ্চ। যার অভিনয়ক্ষেত্র অঙ্গনমঞ্চের মত নয়, তা চার দেওয়ালের বাইরে খোলা জায়গায়। অবশ্য খোলা মাঠে অভিনয়ের কৃতিত্ব বাদলবাবুর ন্য, ১৯৭১ সাল নাগাদ কার্জন পার্ক বা সুরেন্দ্রনাথ পার্কে সিলুয়েট নাট্যগোষ্ঠী প্রতি শনিবার খোলা মাঠে নিয়মিত অভিনয় আরম্ভ করে। তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বাদলবাবু প্রথমবার সুরেন্দ্রনাথ পার্কে ১৭ই মার্চ ১৯৭৩ সালে স্পার্টাকুস অভিনয় করেন মুক্তমঞ্চে। যেখানে অঙ্গনমঞ্চের মত অন্তরঙ্গ দর্শক ঘনিষ্ঠতা নেই, মূলত পথচলতি মানুষরাই দর্শক। তৃতীয় থিয়েটারের আরেক সম্প্রসারিত রূপ। অর্থাৎ মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার আরেকটা ধাপ। আমাদের প্রথম থিয়েটার সেই প্রাকার্য যুগ থেকে মুক্তমঞ্চেই অভিনীত হত। নাট্যশাস্ত্র বলছে ব্রম্ভা রচিত অসুর পরাজয় পালা অভিনয়কালে অসুর সেনাপতি বিরূপাক্ষ বাধা দেন, যেহেতু সেখানে অসুর তথা অনার্যদের প্রতি খারাপ মনোভাব রয়েছে। দ্বিতীয় অভিনয়েও একই কান্ড ঘটে, অবশেষে ব্রম্ভার নির্দেশে বিশ্বকর্মা নাট্যগৃহ নির্মাণ করেন। সুতরাং নাট্যগৃহ নির্মাণের আগে অভিনয় হত মুক্তমঞ্চেই। পরে সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে যত এগিয়েছে, ততই নিজেকে মার্জিত করে তোলার আকাঙ্ক্ষায় শিকড় থেকে সরে এসেছে। নাটকের ক্ষেত্রেও কথাটার ব্যতিক্রম হয়না। যদিও অনেকেই যাত্রা থেকেই নাটকের উদ্ভব বলে থাকেন। যদি তাই হয় তাহলে এটা ভেবে নিতে অসুবিধা হয়না বাদলবাবু শিকড়ে ফিরতে চেয়েছেন। মনে পড়ে যায় শঙ্খ ঘোষের অনুবাদে স্পেনীয় কবি হিমেনেথের সেই বিখ্যাত পঙক্তি- 'শিকড়ের ডানা হোক ডানার শিকড়'।

তিন

সুতরাং বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটার ভাবনার মূলে তিনটি বিষয় কাজ করছে, এক এটা বিকল্প থিয়েটার হিসাবে গড়ে তুলতে চাইছেন। দুই, থিয়েটার দর্শন হিসাবে, এবং তিন, শিকড়ে ফিরতে চেয়েছেন। যদি বিকল্প থিয়েটার ভাবতে চাই তাহলে প্রসেনিয়ামের বিকল্প ভাবনাগুলো কি কি হতে পারে সেদিকে তাকানো যাক। প্রথমত প্রসেনিয়ামে অভিনেতা দর্শকের মাঝে যে বিচ্ছিন্নতা, এমনকি মঞ্চটি দর্শকদের চাইতে উঁচুতে থাকায় সেই বিচ্ছিন্নতা আরো বেড়ে যাওয়া, সেই দূরত্বকে কমিয়ে আনা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, নাটকের অঙ্ক আর দৃশ্যের বিভাজনকে তিনি বর্জন করলেন। সময়ের নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতাকে ভেঙে দিয়ে আগের ঘটনা পরে, পরের ঘটনা আগে আনবার স্বাধীনতাকে নিয়ে এলেন। এমনকি স্থানগত ঐক্যের ধারণাকে অস্বীকার করে একই মঞ্চে নানা ঘটনা দেখানোর ব্যবস্থা করেছেন। তৃতীয়ত, চরিত্রের বদলে একটা ছাঁচ বা প্রোটোটাইপ ধারণা নিয়ে এলেন। স্পার্টাকুস, ভোমা, মিছিল নাটকের চরিত্ররা মূলত এক ছাঁচে বাঁধা। চতুর্থত, উচ্চারিত ভাষার প্রাধান্য কমিয়ে শারীরিক ভাষাকে বেশি ব্যবহার করতে চেয়েছেন। গণ্ডী, ভোমা মিছিল, নাটকে এর ব্যবহার রয়েছে। এখন তৃতীয় থিয়েটার যদি একটি দর্শন হয়, তাহলে এর সাথে জড়িত থাকবে সুগভীর চিন্তাভাবনা, এবং তা বাস্তবায়িত করার সুস্পষ্ট পথ। স্রী সরকারের মতে, তাঁর রচনার বক্তব্য বা কনটেন্টের মধ্য থেকে তাঁর দর্শন বেরিয়ে আসে, আর ফর্ম সেই দর্শনকে তীব্র করে তোলে। অর্থাৎ নাটকের কনটেন্ট ফর্মকে শক্তিশালী করে তোলে। তাই যদি হয় তাহলে নাট্যসমালোচক পবিত্র সরকারের তোলা প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়না। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন- 'কী করে সাগিনা মাহাতো বা এবং ইন্দ্রজিৎ প্রথমে প্রসেনিয়ামে অভিনীত হওয়ার পর আবার থার্ড থিয়েটারের জন্য ভেঙে নেন, যেমন নেন গিরিশচন্দ্রের আবুহোসেন ব্রেশটের ককেশিয়ান চক সার্কেল-কে গন্ডী নাটকে? এই ইঙ্গিতই কী তাহলে করতে হবে তাঁকে যে গিরিশচন্দ্র বা ব্রেশট তাঁদের যথার্থ ফর্ম খুঁজে পাননি? কেবল থার্ড থিয়েটারের মধ্য দিয়েই সেসব নাটকের প্রগাঢ় মূল্য ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে?[৭] এ প্রশ্নের উত্তর পেতে একবার ফর্মকে ছেড়ে কনটেন্টের চিন্তাভাবনার বাস্তবায়নের দিকটা একবার দেখে নেওয়া যাক।

মিছিল নাটকটি ১৯৭৪ সালে তৃতীয় থিয়েটারের জন্য রচিত। নাটকের মুখবন্ধেই নাট্যকার সেকথা জানিয়েছেন। শুধু তাই নয় মঞ্চনির্মাণ কেমন হবে সে প্রসঙ্গেও জানিয়ে রেখেছেন। প্রায় ঊনত্রিশ বছর ধরে আড়াইশোবার অভিনীত হওয়া নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় ১৪ই এপ্রিল ১৯৭৪ (শতাব্দী নাট্যদল) সালে উত্তর চব্বিশ পরগণার রামচন্দ্রপুর গ্রামে। নাটকে একের পর এক মিছিল উপস্থিত হতে দেখা যায়- শোকের মিছিল, ধর্মের মিছিল, বন্যাত্রানের মিছিল। পথে পথে ঘুরে বেড়ায় মিছিলগুলি। রাষ্ট্রব্যবস্থা চাপ দিয়ে বন্ধ করে দিতে চায় মিছিলের স্বর, তবুও মানুষ স্বপ্ন দেখে নতুন মিছিলের, যে মিছিল আগামীকে পথ দেখাবে। নাটকে বিশেষ কোন চরিত্রের ব্যবহার হয়নি, এক দুই, তিন

সংখ্যায় পরিচিত কোরাসের দল ঘুরে ফিরে নানান ভূমিকায় অভিনয় করে। বিশেষ চরিত্র বলতে একজন বুড়ো আর খোকা। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সাধারণ পোশাকেই ঘুরপাক খেতে থাকে। তাদের চোখে মুখে দিন বদলের স্বপ্ন, তারা খুঁজে পেতে চায় বাড়ির সন্ধান। একসময় তারা সেই বাড়ির উদ্দেশ্যে বা শান্তির উদ্দেশ্যে চলতে চলতে সত্যিকারের বাড়ির সন্ধান পায়, দেখা পায় মানুষের-

> "খোকা- কিসের মিছিল?
> বুড়ো- যে মিছিল পথ দেখাবে। বাড়ি যাবার পথ।
> খোকা- (ক্লান্তস্বরে) আমি অনেক মিছিল দেখেছি। কেও পথ দেখায় না। সব একই রাস্তা, একই-
> বুড়ো- চুপ, ঐ শোনো।
> খোকা- সত্যি বলছো, সত্যি মিছিল?
> বুড়ো- মনে হচ্ছে- সত্যি মিছিল।
> খোকা- কাদের মিছিল?
> বুড়ো- মনে হচ্ছে- মানুষের।"[৮]

ভোমা নাটকটি রচিত হয় ১৯৭৫ সালে। প্রথম অভিনীত হয় ২১শে মার্চ ১৯৭৬ সালে (শতাব্দী নাট্যদল) সুন্দরবন রাঙাবেলিয়া গ্রামে। মিছিল নাটকের মত ভোমা নাটকেও তেমন কোনো কাহিনীর ছক নেই। অনেকগুলি খন্ডচিত্রের মধ্যে ভোমাই যেন অদৃশ্য যোগসূত্রের কাজ করে। পৃথিবীর বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদরা একদিকে যখন ভয়ঙ্করতম আনবিক বোমা আবিস্কারের নেশায় মশগুল, অন্যদিকে তখন বিকলাঙ্গ, ভিখারি আকীর্ণ পৃথিবী অহল্যাভূমিতে পরিণত হতে চলেছে। অতীতের বীরত্বের কাহিনী এখন শুধুই ইতিহাস। সাধারণ মানুষ এখন দিনে দিনে নিস্তেজ হতে চলেছে, ধীরে ধীরে আমরা গাঢ় অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছি। ক্লান্ত অবসন্ন ভোমা তবু শেষ শক্তি সম্বল করে জ্বলে ওঠে ভারি কুড়ুল হাতে-

> "মারো জোয়ান হেঁইও! জঙ্গল কাটো হেঁইও! বিষের জঙ্গল হেঁইও! ...আগুন জ্বলে হেঁইও!"[৯]

নাটকের মুখবন্ধে নাট্যকারের কথানুযায়ী নাটকে চরিত্র নেই, গল্প নেই, ধারাবাহিকতা নেই। ভোমার অভিনয় দেখে কেতকী কুশারী ডাইসন একটি প্রবন্ধে (ভোমা : একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা) তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে লিখেছেন-

> "বাদলবাবু প্রচলিত থিয়েটারের আঙ্গিকগুলোকে ভেঙেছেন, কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। পরীক্ষামূলকভাবে আঙ্গিক হয়তো অনেকেই ভাঙতে পারেন, কিন্তু আঙ্গিক ভাঙলেই নতুন শিল্পসত্ত্বার জন্ম দেওয়া হয়না। বাদলবাবু কতগুলো জিনিস ভেঙেচুরে আবার একটা নতুন জিনিস গড়েছেন, এবং যা গড়েছেন তা একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদের থিয়েটার, ভারতে যার একান্ত প্রয়োজন ছিল, এবং এখানেই তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষার চূড়ান্ত সার্থকতা।"[১০]

তৃতীয় থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য বাদল সরকার প্রায় ছাব্বিশটির মত নাটক রচনা করেছিলেন। সেগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্রতিটি নাটকের কনটেন্ট বা বিষয়বস্তু তৃতীয় থিয়েটারের আদলেই করতে চেয়েছেন। প্রতিটি নাটকেই (মিছিল এবং ভোমা নাটকের বিষয়বস্তু দেখানো হয়েছে আলোচনার সুবিধার্থে) সাধারণ মানুষের কথা এসেছে, তাদের জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলি এসেছে, সর্বোপরি কনটেন্টের মধ্যে জীবনদর্শন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

বিকল্প থিয়েটার এবং দর্শন ছাড়াও তৃতীয় যে বিষয়টিকে আলোচনায় সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিতে চেয়েছি তা হল শিকড়ের সন্ধান। কলকাতার বাংলা নাট্যচর্চা যা ১৭৯৫ সালে শুরু হয়েছিল প্রথম দিকে তা লোকনাট্যের উপাদান গ্রহণ করলেও শখের থিয়েটার পর্বে খুব একটা প্রাধান্য দেয়নি। কিন্তু ১৮৭২ সালে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে পেশাদার থিয়েটারের যে পথচলা আরম্ভ হয় সেখানে লোকসমাজের কাছে খুলে যায় মঞ্চ। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জনপ্রিয় আঙ্গিক স্থান করে নেয় সেখানে। আরও পরবর্তীকালে ১৯০৫ এর পরে রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রসেনিয়াম থেকে সরে আসার সচেতন প্রয়াস দেখা যায়। ১৯৪০ পরবর্তী আই পি টি এ একপ্রকার রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণেই হয়ত শিকড়ে ফিরে আসার চেষ্টা করে। ওই সময় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারতের মর্মবাণী প্রবন্ধ[১১] পাঠ করলে তার কিছুটা

আঁচ পাওয়া যায়। স্বাধীনতার পরে ১৯৬৬ সালে ইস্ট-ওয়েস্ট সেমিনারের আলোচিত বিষয়ের শিরোনাম ভাবা হচ্ছে- 'শিকড়ের সন্ধান'। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে আধুনিক থিয়েটারের অভিমুখ কোনদিকে। এমনকি এর প্রভাব পড়ে পরবর্তী নাট্যচর্চায়। ১৯৭২ এ মারীচ সংবাদ-এ (অরুণ মুখোপাধ্যায়) প্রসেনিয়াম ভাঙা অভিনয়, ১৯৭৬ এ টিনের তলোয়ার(উৎপল দত্ত) রচনায় যাত্রা রীতির প্রয়োগ, অনেকটা লোক-এর কাছাকাছি এসে যায়। ১৯৮৮ তে কিনু কাহারের থেটার, যাত্রার কনসার্ট লণ্ঠন ব্যবহার করা হয়। ১৯৮৮ সালেই বিভাস চক্রবতীর মাধব মালঞ্চী কইন্যা, ছাড়াও দক্ষিন রায়ের পালা (১৯৯৮, কসবা অর্ঘ্য), ফুল্লকেতুর পালা (২০০২, বহুরূপী), সোজন বাদিয়ার ঘাট (২০০৩, নান্দীকার), গৌতম হালদারের মৈমনসিংহ গীতিকা (২০০৩, নয়ে নাটুয়া)। এই ধারতেই বাদলবাবুর তৃতীয় থিয়েটার শিকড়কে আঁকড়ে প্রসেনিয়ামের বিকল্প হিসেবে গড়ে উঠতে চেয়েছিল। কতটা হয়ে উঠতে পেরেছিল সময় তার হিসাব রেখেছে। প্রসেনিয়াম আজও স্বমহিমায় টিকে রয়েছে, কিন্তু তৃতীয় থিয়েটার? তাহলে কি সত্যিই কোথাও গলদ রয়ে গিয়েছিল, নাকি বিশ্বায়নের হাত ধরে মানুষ আরো বেশি বুর্জোয়াতন্ত্রের দাসত্ব স্বীকার করে নিচ্ছে প্রতিনিয়ত। নাকি উৎপল দত্তের কথা মেনে নিয়ে আমাদেরও বলতে হয়- বিদেশের ঐ নাট্যধারার মধ্যে নতুন কোন সম্ভাবনা সত্যিই ছিল না।তবে সম্ভাবনা থাক, আর না থাক এটুকু আমাদের সকলকে একবাক্যে স্বীকার করতেই হয়, ওইরকম একটা অস্থির সময়ে বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারচর্চা ছিল বলেই আজও নতুন পথে নতুন ভাবনায় বিকল্প থিয়েটার চর্চা করার অবকাশ পাই।

তথ্যসূত্র :

১. সরকার, বাদল, থিয়েটারের ভাষা, নভেম্বর ১৯৮৩, কালি কলম ইজেল, কলকাতা, পৃ. ১৪-১৫
২. গণশক্তি, ১১ই এপ্রিল, ১৯৮৯, পৃ. ৬
৩. সরকার, পবিত্র, নাটমঞ্চ নাট্যরূপ, ১লা বৈশাখ, ১৩৭১, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ২৮০
৪. মুন্সী, পঙ্কজ, অনন্য বাদল সরকার, বহুরূপী ১১৭, মে ২০১২, পৃ. ২১৬
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য, ব্রেশট ও তাঁর থিয়েটার, ৮ই মে, ১৯৭৭, আশা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৮১
৬. পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা (১৬), বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, ২রা সেপ্টেম্বর ২০১৪, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ২৭
৭. সরকার, পবিত্র, নাটমঞ্চ নাট্যরূপ, ১লা বৈশাখ ১৩৭১, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ২৯০
৮. সরকার, বাদল, বাদল সরকার নাটকসমগ্র, ৩য় খন্ড, প্রথম প্রকাশ- শ্রাবণ ১৮০৭, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, পৃ. ২৩৮-৩৯
৯. তদেব, পৃ. ৩৩২
১০. ডাইসন, কেতকী কুশারী, ভাবনার ভাস্কর্য (প্রবন্ধ ও গ্রন্থ সমালোচনা ১৯৫৭-৫৯), প্রথম প্রকাশ ১৯৫৯, দেজ পাবলিশিং, পৃ. ২
১১. বহুরূপী ৩৪, জুন ১৯৭০ (নবান্ন স্মারক সংখ্যা), সম্পাদক-চিত্তরঞ্জন ঘোষ, পৃ. ১১৯-২০